সাহিত্য পত্রিকা ॥ বর্ষ : ৫৫ ॥ সংখ্যা : ৩ ॥ জুন ২০১৮

রবীন্দ্রসংগীতে বৌদ্ধ ভাবাদর্শ

শাহনাজ নাসরীন ইলা*

সারসংক্ষেপ: বৌদ্ধদর্শন ও চেতনার মূল কথা হল ত্যাগ ও সংযম। রবীন্দ্রসাহিত্য ও দর্শনে এই ত্যাগ ও সংযমের ব্যাপক প্রতিফলন ঘটেছে। রবীন্দ্রনাথ জীবনের শেষদিন পর্যন্ত বৌদ্ধভাবাদর্শের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। এই চেতনা রবীন্দ্রনাথের জীবন, সাহিত্য ও চিন্তাধারাকে স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করতে সাহায্য করেছে। রবীন্দ্রসংগীতে বৌদ্ধদর্শন ও ভাবনার প্রতিফলন উপলব্ধি বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রাহ্ম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর জন্মের পূর্ব থেকেই ঠাকুর পরিবারে হিন্দুপদ্ধতি আচার অনুষ্ঠান, মূর্তিপূজা, পশুবলি ইত্যাদি বর্জিত হয়েছিল। ঠাকুর পরিবারের অনেকে বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের জন্মের পূর্বে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর সিংহল যান এবং বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে কৌতূহলী হয়ে ওঠেন। সিংহলে মহর্ষির ভ্রমণ-সঙ্গী ছিলেন পুত্র সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং কেশবচন্দ্র সেন। রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দ্বিজেন্দ্রনাথ বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কিত প্রবন্ধ 'আর্যধর্ম এবং বৌদ্ধধর্মের পরস্পর ঘাত-প্রতিঘাত ও সংঘাত' (১৮৯৯) এবং সত্যেন্দ্রনাথ 'বৌদ্ধধর্ম' (১৯০১) শীর্ষক প্রবন্ধ লিখেছেন। রবীন্দ্র-মানস গঠনে বৌদ্ধ প্রভাব প্রতিফলনে ঠাকুর বাড়ীর পরিবেশের প্রভাব অনস্বীকার্য। (অরূপকুমার ১৪০৩ : ১৩৩) সঙ্গত কারণেই রবীন্দ্রনাথের গান, কবিতা, নাটক, প্রবন্ধে বৌদ্ধধর্ম-সংস্কৃতির অজস্র প্রভাব লক্ষ করা যায়। রবীন্দ্রনাথ বুদ্ধদেবকে অন্তরের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মানব বলে উপলব্ধি করেছেন। কবির কাছে তিনি যেন মূর্তিমান অসীম প্রজ্ঞা, অসীম করুণা। অবশ্য বৌদ্ধধর্ম-তত্ত্ব ও দর্শন অপেক্ষা মানবকল্যানকর আদর্শ, প্রেম, মৈত্রী, করুণা, অহিংসার প্রতি অধিকতর আকৃষ্ট হয়েছেন তিনি। তিনি বলেছেন, 'হীনযানের দিকে যখন দেখি তখন মনে হয় বৌদ্ধধর্মে পূজা ভক্তি বুঝি নাই, প্রত্যক্ষের অতীত কোনো মহৎ সত্তাকে বৌদ্ধধর্ম বুঝি একেবারেই অস্বীকার করে – আবার মহাযানের দিকে তাকাইলে মনে হয় ভক্তির প্রবল উচ্ছ্বাসে বৌদ্ধধর্ম নানা বিচিত্র রূপ রস সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে, কোথাও তাহার জ্ঞানের সংযম নাই। কিন্তু আসল কথা, বৌদ্ধধর্মে এই দুটো

---

*অধ্যাপক, সংগীত বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

https://doi.org/10.62328/sp.v55i3.5

দিকই আছে। সমস্ত কামনা ও কর্ম নিঃশেষে ধ্বংস করিয়া নির্বাণমুক্তির মধ্যেই যে একেবারে আপনাকে 'না' করিয়া দেওয়াই যে বৌদ্ধ ধর্মের চরম লক্ষ নহে তাহা একটু চিন্তা করিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে। সর্বভূতের প্রতি প্রেম জিনিসটি শূন্য পদার্থ নহে। প্রেমের দ্বারা সমস্ত সম্বন্ধ সত্য ও পূর্ণ হয়। কোনো সম্বন্ধ ছিন্ন হয় না। অতএব প্রেমের চরমে যে বিনাশ ইহা কোনো মতেই শ্রদ্ধেয় নহে।' (রবীন্দ্রনাথ ১৩৯২ : ২০) এ প্রসঙ্গে তিনি আরো বলেছেন 'প্রেম হচ্ছে স্বতই আনন্দ, স্বতই পূর্ণতা; সে কিছুই নেওয়ার অপেক্ষা করে না, সে যে কেবলই দেওয়া। যে দেওয়ার মধ্যে কোনো নেওয়ার সম্বন্ধ নেই সেইটেই হচ্ছে শেষের কথা, সেইটেই ব্রহ্মের স্বরূপ – তিনি নেন না। এই প্রেমের ভাবে, এই আদানবিহীন প্রদানের ভাবে আত্মাকে ক্রমশ পরিপূর্ণ করে তোলবার জন্য বুদ্ধদেবের উপদেশ আছে, তিনি তাঁর সাধন প্রণালীও বলে দিয়েছেন। এ তো বাসনা সংহরণের প্রণালী নয়, এ তো বিশ্ব হতে বিমুখ হবার প্রণালী নয়, এ যে সকলের অভিমুখে আত্মাকে ব্যাপ্ত করবার পদ্ধতি। এই প্রণালীর নাম 'মেত্তিভাবনা' – মৈত্রীভাবনা। প্রতিদিন এই কথা ভাবতে হবে :

সব্বে সত্তা সুখিতা হোন্ত,
অবেরা হোন্ত,
অব্যাপজ্‌ঝা হোন্ত,
সুখী সত্তাজং পরিহরন্ত,
সব্বে সত্তা মা যথালব্ধসম্পত্তিতো বিগচ্ছন্ত।

সকল প্রাণী সুখিত হোক, শত্রুহীন হোক, অহিংসিত হোক, সুখী আত্মা হয়ে কালহরণ করুক। সকল প্রাণী আপন যথালব্ধ সম্পত্তি হতে বঞ্চিত না হোক। মা যেমন একটিমাত্র পুত্রকে নিজের আয়ু দিয়ে রক্ষা করেন সমস্ত প্রাণীতে সেই প্রকার অপরিমিত মানস রক্ষা করবে। ঊর্দ্ধে অধোতে চারদিকে সমস্ত জগতের প্রতি বাধাহীন হিংসাহীন শত্রুতাহীন অপরিমিত মানস এবং মৈত্রী রক্ষা করবে।' (রবীন্দ্রনাথ ১৩৯২ : ২০)

১৯১৪ সালে বুদ্ধগয়ায় বুদ্ধমূর্তি দর্শন করে তাঁকে প্রণতি জানাবার যে ব্যাকুলতা রবীন্দ্রনাাথ অনুভব করেছিলেন, শেষ জীবনেও সেই মনোভাব অটুট ছিল। ১৩৪২ সালে সারানাথে গিয়ে তিনি শ্রদ্ধাভরে বলেছেন 'আমি যাঁকে অন্তরের শ্রেষ্ঠমানব বলে উপলব্ধি করি, আজ এই বৈশাখী পূর্ণিমায় তাঁর জন্মোৎসবে আমার প্রণাম নিবেদন করতে এসেছি।'[৪] বুদ্ধদেবের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা ও অনুরাগবশত রবীন্দ্রনাথ বুদ্ধগয়ায় দু'বার গিয়েছিলেন। বুদ্ধের মন্দির দর্শনে তিনি শান্তি পেয়েছেন, তাঁর অস্তিত্ব অনুভব করেছেন হৃদয়মনে।

পরিশেষ কাব্যে 'বুদ্ধের প্রতি' কবিতায় লিখেছেন –

ওই নামে একদিন ধন্য হল দেশে দেশান্তরে
তব জন্মভূমি।

সেই নাম আরবার এ দেশের নগরে প্রন্তরে
দান করো তুমি।
বোধিদ্রুমতলে তব সেদিনের মহাজাগরণ
আবার সার্থক হোক, মুক্ত হোক মোহ-আবরণ,
বিস্মৃতির রাত্রিশেষে এ ভারতে তোমার স্মরণ
নবপ্রাতে উঠুক কুসুমি।

এ কাব্যেরই 'বোরবোদুর' কবিতায় যখন বলেন– 'বুদ্ধের শরণ লইলাম', তখন তা কবির অন্তর-নিঃসৃত আকুতিরূপেই প্রকাশিত হয়। পরাধীনতার গ্লানিতে, হিংসার উন্মত্ততায় ইহারই ভিতর যেন কবি পরিত্রাণের আশ্রয় খুঁজিয়া পাইয়াছিলেন। অমিয় প্রেমের মন্ত্রে যিনি উচ্চারণ করেছিলেন এবং 'মৌন যাঁর শান্তি অন্তহারা/ বাণী যার সকরুণ সান্ত্বনার ধারা' সেই মহামানবকে তিনি বারবার স্মরণ করেছেন: বলেছেন প্রেম এবং অহিংসার বাণীই হিংসার তাণ্ডবে উন্মত্ত পৃথিবীকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে পারে। পাশবিকতার সাহায্যে মানুষের সিদ্ধিলাভের দুরাশাকে যিনি নিরস্ত করতে চেয়েছিলেন, যিনি বলেছিলেন,'সম্বোধেন জিনে ক্রোধ'; আজ সেই মহাপুরুষকে স্মরণ করে মনুষ্যত্বের জগৎব্যাপী এই অপমানের যুগে আবার বলবার দিন এল : 'বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি।' (রবীন্দ্রনাথ ১৩৯২ : ২০) বৌদ্ধধর্মে মানব সম্পর্ক দয়া, মায়া, করুণা, প্রেম, মৈত্রী ইত্যাদি মানুষের হৃদয়ের সুকোমল হৃদয়বৃত্তিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। মানুষের মধ্যে যে শ্রেয়বোধ কল্যাণকর মহিমা নিহিত আছে, তাকে উদ্বুদ্ধ করাই বৌদ্ধ ধর্মের প্রধান লক্ষ্য।

বৌদ্ধধর্ম নিরীশ্বরবাদী। রবীন্দ্রনাথ ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসী ছিলেন। প্রবোধচন্দ্র সেনের মতে, 'বৌদ্ধ ধর্মের অহিংসা, করুণা ত্যাগ মৈত্রী,ঐক্য, সংহতি এবং সব মানুষের সমতা প্রধানত এই কটি নীতিই বৌদ্ধ সংস্কৃতি ও রবীন্দ্রসংস্কৃতির মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করেছে। (প্রবোধচন্দ্র ১৪০৪ : ২৫) নির্বাণ লাভের মধ্যদিয়ে যে মুক্তির কথা বুদ্ধদেব বলেছেন রবীন্দ্রনাথ অবশ্য সে মুক্তির কথা বলেননি। সংসার বন্ধন থেকে মুক্তিলাভ করাকে রবীন্দ্রনাথ মুক্তি বলে মনে করেন না। তাঁর কণ্ঠে বিপরীত সুরই ধ্বনিত হয়েছে –

বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়
অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময়
লভিব মুক্তির স্বাদ।

রবীন্দ্রনাথ যে বন্ধনের কথা বলেছেন তা হল আনন্দের বন্ধন, প্রেমের বন্ধন। এই প্রেমেই আছে মুক্তির আস্বাদ; প্রেমেই পূর্ণতা; সত্যতা। (অনীতা ১৪০৩ : ৩৯) এই মহামানব ও তাঁর বাণী, বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতি রবীন্দ্রনাথের গানে, কবিতায়, নাটকে, প্রবন্ধে লক্ষ করা যায়। এ প্রসঙ্গে তাঁকে প্রেরণা দিয়েছিল রাজেন্দ্রলাল মিত্রের *The Sanskrit Buddhist literature of Nepal* গ্রন্থখানি। এডুইন আর্নলণ্ডের *The Light of Aria* কাব্যখানিও উল্লেখযোগ্য। রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতির রূপ, রস, বর্ণ, গন্ধ, দুঃখ-

সুখ, স্নেহপ্রেমময় এ ধরাতলে বার বার ফিরে আসতে চেয়েছেন। বুদ্ধগয়াতে বসে তিনি রচনা করলেন –

আবার যদি ইচ্ছা কর আবার আসি ফিরে
দুঃখ সুখের ঢেউ খেলানো এই সাগরের তীরে ॥ ...
আবার তুমি ছদ্মবেশে আমার সাথে খেলাও হেসে গো,
নূতন প্রেমে ভালবাসি আবার ধরণীরে ॥

'বুদ্ধদেব' নামক প্রবন্ধে তিনি আক্ষেপ করে বলেছেন যে, বুদ্ধদেবের চরণস্পর্শে যেদিন বসুন্ধরার মাটি পবিত্র হয়েছিল সেদিন তা শরীর মন দিয়ে প্রত্যক্ষ করার জন্য তিনি কেন জন্মগ্রহণ করেনি। বুদ্ধগয়ায় বুদ্ধদেবের মূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে তিনি শ্রদ্ধা ও ভক্তিতে আপ্লুত হয়েছিলেন। শুধু গয়া কেন, শ্যাম, ব্রহ্মদেশ, জাভা ইত্যাদি জায়গায় ভ্রমণের সময়েও বুদ্ধদেবের প্রতি অশেষ শ্রদ্ধা ও বিস্ময় প্রকাশ করেছেন তিনি। পাষাণ স্তূপের সামনে দাঁড়িয়ে বলেছেন : 'বুদ্ধের স্মরণ লইলাম'। (সুধাংশু ১৪০৪ : ৭৮)

রবীন্দ্রচিন্তায় বৌদ্ধ ভাবনার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অনুপ্রেরণা লক্ষ্য করা যায়। কোনও একটা শব্দ, চিত্রকল্পের একটা ব্যঞ্জনা ইত্যাদির মধ্যে এই ভাবনার সংকেত পাওয়া যায়। বহু সময়েই বিশ্বদেবতা এবং করুণাঘনরূপী বুদ্ধ সমীকৃত হয়ে গেছেন।

রবীন্দ্রনাথ দুবার বুদ্ধগয়া ভ্রমণ করেছেন। দ্বিতীয়বার ১৯০৪ সালে ভ্রমণকালে তাঁর সঙ্গী ছিলেন কন্যা মীরা ও জামাতা নগেন্দ্রনাথ। তিনদিন অবস্থানকালে তিনি 'গীতালি'র অন্তত দশটি গান রচনা করেন –

এদিন আজি কোন ঘরে গো খুলে দিল দ্বার ?
আজি প্রাতে সূর্য উঠা সফল হল কার ?

বৈশাখী পূর্ণিমা উপলক্ষে রচিত –

হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বি, নিত্য নিঠুর দ্বন্দ্ব,
ঘোর কুটিল পন্থ তার, লোভ জটিল বন্ধ ॥ ...
শান্ত হে, মুক্ত হে, হে অনন্তপুণ্য
করুণাঘন, ধরণীতল কর' কলঙ্কশূন্য ॥

এবং

সকল কলুষতামসহর, জয় হোক তব জয়
অমৃতবারি সিঞ্চন কর' নিখিল ভুবনময় ...
করুণাময়, মাগি শরণ – দুর্গতিভয় করহ হরণ,
দাও দুঃখবন্ধতরণ মুক্তির পরিচয় ॥

গানটিতে কবি সকল কলুষতামসহর আখ্যা দিয়ে বুদ্ধদেবের জয়গান গেয়েছেন। সমস্ত সংশয়, জটিল-গহন পথসংকট কাটিয়ে মহাশক্তি-মহাপ্রেম-মহাক্ষেম-মহাপুণ্য-মহাপ্রেমের মহিমায় করুণাময় বুদ্ধের শরণ কামনা করেছেন।

বৌদ্ধ সাহিত্যে 'শরণ' শব্দের ব্যবহার বৌদ্ধধর্ম বিকাশের প্রথম যুগ থেকেই চলে এসেছে। বিনয় পিটকের পরম্পরা অনুসারে ত্রিশরণ (বুদ্ধ, ধর্ম, সংঘ) মন্ত্রের ব্যবহার বৌদ্ধ ধর্মের মধ্যে উপসম্পদা গ্রহণের সময় থেকেই স্বীকৃত হয়েছে। (অনীতা ১৪০৩ : ৩৯)

বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি
ধর্মং শরণং গচ্ছামি
সংঘং শরণং গচ্ছামি ॥

'শরণ' শব্দটি এখানে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। সংসারের নিত্য নিয়ত দুঃখে কাতর জীব আর্ত হয়ে বুদ্ধের শরণ প্রার্থনা করছে। এ প্রসঙ্গে কিছু গান নিম্নে প্রদত্ত হল –

১. সকল কলুষ তামস হর, জয় হোক তব জয়
২. হে মহাজীবন, হে মহামরণ, লইনু শরণ
৩. শুনেছে তোমার নাম অনাথ আতুর জন
৪. আজি মম মন চাহে
৫. তুমি বন্ধু তুমি নাথ
৬. নমি নমি চরণে

রবীন্দ্রনাথের রচনায় প্রায়শই মৈত্রী ও করুণা উপলব্ধির প্রকাশ লক্ষ করা যায়। ভগবান বুদ্ধের লক্ষ্য ছিল অনির্বচনীয় আনন্দলোক প্রাপ্তি। কিন্তু অহংবোধ থাকলে সেই আনন্দ কখনোই লাভ করা যায় না। তাই তিনি বারবার বাসনাবিলুপ্তির কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন মানুষকে সব সময় সর্বপ্রাণীর কল্যাণচিন্তায় নিমগ্ন থাকতে। তাকে প্রেম-অভিমুখী, কল্যাণ ও মৈত্রী-অভিমুখী হতে হবে। সমস্ত সত্তাই সুখী হোক– এই চিন্তা রবীন্দ্রমানসেও জাগ্রত হয়ে উঠেছিল। (অনীতা ১৪০৩ : ৩৯) এ ধারার কিছু গান নিম্নে প্রদত্ত হলো-

১. পদপ্রান্তে রাখো সেবকে
২. অন্ধজনে দেহ আলো
৩. জীবন যখন শুকায়ে যায়
৪. জর জর প্রাণে নাথ
৫. তোমারি সেবক করো হে
৬. আমি বহু বাসনায় প্রাণপণে চাই

ধর্মপদে বলা হয়েছে,

অত্তাহি অত্তনো নাথো
অত্তাহি অত্তনো গতি।

অর্থাৎ নিজেই নিজের প্রভু, নিজেই নিজের আশ্রয়। মানুষের আত্মশক্তিকে বৌদ্ধদর্শনে অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। বুদ্ধদেবের মতে মানুষ আত্মশক্তির বলেই পূর্ণতা লাভ করতে পারে। এর জন্য ঐশ্বরিক করুণা বা সহায়তার প্রয়োজন হয় না। বুদ্ধদেব মানুষের কর্মের মধ্যেই মানবতার শ্রেষ্ঠ মহিমা উপলব্ধি করেছেন। অন্যান্য ধর্ম ও দর্শন যেখানে ঈশ্বরের কৃতিত্ব ও মহিমাকে সর্বোচ্চ স্থান দিয়েছে, বুদ্ধদেব সেখানে মানুষের আত্মশক্তি ও বিকাশক্ষমতাকে সর্বাধিক মর্যাদা দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথও মানুষের আত্মশক্তিকেই সমধিক মর্যাদা দিয়েছেন। দয়া, কল্যাণ তিনি মানুষের অন্তর থেকে আহ্বান করেছিলেন, স্বর্গ থেকে নয়। *গীতাঞ্জলিতে* তিনি বলেছেন – বিপদে মোরে রক্ষা কর, এ নহে মোর প্রার্থনা'। আত্মশক্তির প্রেরণামূলক কিছু গান –

১. আমি মারের সাগর পাড়ি দেব
২. তোমার পতাকা যারে দাও
৩. বিপদে মোরে রক্ষা করো
৪. বল দাও মোরে বল দাও
৫. বুক বেঁধে তুই দাঁড়া দেখি
৬. অন্তর মম বিকশিত কর

উল্লেখ্য, বৌদ্ধ- অনুভাবনার অভিঘাতই এ গানগুলোতে গভীরতর। 'আমি মারের সাগর পাড়ি দেব' – গানটি স্পষ্টভাবে বৌদ্ধ তত্ত্বানুষঙ্গ অনুসারী। 'মারের' প্রলোভন জয় করেছিলেন তথাগত– এই তাত্ত্বিক-কিংবদন্তির তাৎপর্য এভাবেই বুঝতে হবে যে, আত্মশক্তি সংহত করেই মোহ, বাসনা, আকাঙ্ক্ষা ইত্যাদির নির্বাণপথ দেখিয়েছিলেন তিনি। (অনীতা ১৪০৩ : ৩৯)

বুদ্ধদেব শিষ্যদের উপদেশ দিয়ে বলেছে, একো চরে খগগ্‌বিসান কপ্পো (সুত্তনিপাত খগগ্‌বিসান) অর্থাৎ খড়গ বিচারের ন্যায় একাকী বিচরণ করো। রবীন্দ্রনাথও বলেছেন – সত্যের পথে, ন্যায়ের পথে সঙ্গী না জুটলে একাই অগ্রসর হতে হবে।

যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে,
তবে একলা চলো রে।

রবীন্দ্রনাথ দুঃখের মধ্যেই আনন্দের সন্ধান করেছেন। দুঃখের বক্ষের মাঝে তিনি আনন্দস্বরূপকে উপলব্ধি করতে চেয়েছেন। দুঃখ ও মৃত্যুর ভূমিকা বৌদ্ধদর্শনে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। তথাগত বলেছেন যে বিশ্বের দুঃখ অগাধ ও অপর্যাপ্ত। তিনি এই দুঃখের কারণ নির্ণয় করে তার নিরোধের উপায় স্বরূপ দুঃখের মূলে কুঠারাঘাত করতে বলেছেন। তাঁর মতে অবিদ্যার ক্ষয় হলে সংস্কারের ক্ষয় ও বিজ্ঞানের ক্ষয় হলে নামরূপের এবং বেদনার ক্ষয়। এইভাবে তৃষ্ণা ও উপাদানের ক্ষয় সম্ভব। তবে

উপাদানের ক্ষয় হলে আর জন্ম নাই, জরা নাই। ব্যাধি নাই মৃত্যু নাই অর্থাৎ দুঃখ নাই। (অনীতা ১৪০৩ : ৩৯) যে মানুষ সত্যের জন্য জীবন উৎসর্গ করেছে, দেশের জন্য, অপরের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করেছে সে সহজেই সুখকে ত্যাগ করতে পারে এবং দুঃখকে জয় করতে পারে। দুঃখকে স্বীকার করে নিয়ে তাকে অতিক্রম করার সাধনা আমরা দেখতে পাই *নটীর পূজা*-র নটীর চরিত্রে, *প্রায়শ্চিত্ত* নাটকে ধনঞ্জয় বৈরাগীর সাধনায়। এই সাধনা *গীতাঞ্জলি*'র, *রাজা* নাটকেরও। বৌদ্ধভাবাদর্শে রবীন্দ্রনাথের কিছু গান –

১. আছে দুঃখ, আছে মৃত্যু
২. তোমার অসীমে প্রাণ মন লয়ে
৩. আমার সকল দুখের প্রদীপ
৪. অচেনাকে ভয় কী আমার ওরে
৫. এবার দুঃখ আমার
৬. আগুনের পরশমণি

বৌদ্ধ দর্শন ও চেতনার মূল কথা হলো ত্যাগ ও সংযম। রবীন্দ্রসাহিত্য ও দর্শনে এই ত্যাগ ও সংযমের ব্যাপক প্রতিফলন ঘটেছে। রবীন্দ্রনাথ জীবনের শেষদিন পর্যন্ত বৌদ্ধভাবাদর্শের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। এই চেতনা রবীন্দ্রনাথের জীবন, সাহিত্য ও চিন্তাধারাকে স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করতে সাহায্য করেছে। বুদ্ধদেব জাতি নির্বিশেষে মানুষকে বড় করে দেখেছেন। যাগ-যজ্ঞের আড়ম্বড়তা থেকে মানুষকে মুক্তি দিয়েছেন। তিনি মানুষের আত্মশক্তি প্রচার করেছেন। দয়া, কল্যাণ প্রভৃতি তিনি স্বর্গ থেকে প্রার্থনা করেন নি। অন্তর থেকে আহ্বান করেছেন। মানুষ যে দৈবাধীন, দীনহীন পদার্থ নয়, সে কথা বুদ্ধদেবই প্রথম বলেছেন। মানুষের মধ্যে যে উদ্যম, আত্মশক্তি, শ্রেয়োবোধ, কল্যাণশক্তি লুকিয়ে আছে তাকে উদ্বুদ্ধ করাই বৌদ্ধ ধর্মের প্রধান লক্ষ্য। রবীন্দ্রনাথও এই মন্ত্রেই দীক্ষিত হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের মানবধর্ম এবং বুদ্ধের অহিংসা, করুণা, ত্যাগ, প্রেম, মৈত্রী একত্রে একটি যোগসূত্র রূপে কাজ করেছে।

গ্রন্থপঞ্জি

অনীতা মুখোপাধ্যায় (১৪০৩)। 'রবীন্দ্রসংগীতে বৌদ্ধ অনুপ্রেরণা', রবীন্দ্রসংখ্যা, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, পশ্চিমবঙ্গ

অরূপকুমার চট্টোপাধ্যায় (১৪০৩)। 'রবীন্দ্রনাটকে বৌদ্ধভাবনা', রবীন্দ্রসংখ্যা, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, পশ্চিমবঙ্গ

প্রবোধ চন্দ্র সেন (১৪০৪)। *ধর্ম চিন্তা*, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলিকাতা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৩৯২)। *বুদ্ধদেব*, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলিকাতা

সুধাংশুবিমল বড়ুয়া (১৪০৪)। *রবীন্দ্রনাথ ও বৌদ্ধ সংস্কৃতি*, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলিকাতা